OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 104 - 112
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বিমল করের ছোটগল্পে মৃত্যুর অনন্যতা

সুপর্ণা হালদার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suparnahalder208@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Death, Multifaceted, Psychological, Degeneration, Fragmented, Grief, Interspersed, Realization, Illuminated.

Abstract
Bimal Kar, a renowned writer of the seventies and eighties of the twentieth century, holds a unique position in the history of Bengali literary practice with his philosophy of literature and distinct perception of life. Eschewing complexity in writing and rising above the use of complicated language, he presents the loneliness of the individual flowing in the muddy currents of life, the fulfillment of self-interest, psychological transformations, the silent footsteps of sin, and the all-consuming hunger of death through a simple arrangement of sentences. He perceived the distance between life and death through his own experiences and deep self-realization. Hence, in much of his creative thought, the subject of death has emerged as an aid to the complete development of life awareness. Though there is grief in that death, it does not exceed the bounds of restraint. Not only physical death but death in its multifaceted form has appeared in his writings. In short stories such as 'Atmaja', 'Janani', 'Teen Premik O Bhuban', 'Apeksha', 'Agurlata', 'Nishad', 'Ambikacharaner Mrityu', and many others, the theme of death has been raised multiple times. However, not all deaths are merely physical; the mental degeneration of the individual, the decay of values, and the demise of ethics are largely spread across his stories. The story "Atmaja" begins with a beautiful relationship between a father and daughter but ends with the death of the father, Himanshu. Himanshu chooses the path of suicide. The sequence of events in the entire story has accelerated the cause-and-effect relationship of Himanshu's suicidal intent. His discord with Yuthika has increased the distance in their relationship, marking the decline of their marital bond. Yuthika's inferiority complex has led to the mental demise of Yuthika's mindset, while her distorted behavior has advanced the positivity of Himanshu's mind towards death. Again, in stories like "Janani" and "Teen Premik O Bhuban", paths to recovery from grief are discovered. There is undoubtedly sorrow in death, but what is the path to recovery from grief? The author has expressed this through his philosophical reflections in those stories. After their mother's death, the children wish to offer their mother, on her heavenly journey, certain qualities that she had lost due to the harsh conflicts of real life. In the discussed stories, the author shows the way to overcome grief by completing the mother's fragmented soul after her death. In the similar story "Teen Premik O Bhuban",

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Shivani's three lovers offer their long-held remorse to the flames of her pyre. By sacrificing their self-pride before Shivani's pyre, their self-criticism and self-analysis help them rise above the burning power of grief. In the story 'Apeksha ' there is a person waiting for the death of a person. The story of 'Anguralata' depicts the picture of social degradation. The story of 'Idur ' is a sharp analysis of the author's realistic social thinking and the everyday crisis of people's lives. In the story "Nishad" too, the inevitability of death is victorious. In addition, stories like "Sunya", "Sudhamoy", "Janoar", etc., also portray death with a sense of change. Indeed, Bimal Kar's entire imaginative creation is interspersed with a subtle analysis of life perspectives. Not denying death, but by accepting it, enjoying the path between life and death is essential, this realization has illuminated him with the consciousness of death.

Discussion

'বেদনা' থেকে শিল্পীর মনে যে প্রেরণার সৃষ্টি হয় তা তাঁর সৃষ্টির উৎসমুখকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। বেদনার তীব্রতায় স্রষ্টার সৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিধাতা যাঁকে এই বেদনা ধারণে সক্ষমতা দান করেন, তাঁকেই তিনি শিল্প সৃষ্টির দায়িত্ব দেন। আর এই বেদনার মূল ভরকেন্দ্রে অবস্থান করে স্রষ্টার মৃত্যু চেতনা। যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে মৃত্যু কেন্দ্রিক যে চিন্তাভাবনাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু দার্শনিক মতাদর্শের সূচনা হয়েছে। যদিও এই দার্শনিক মতাদর্শগুলি সর্বদা একই থাকে নি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পরিবর্তনও ঘটেছে যা মানুষের মৃত্যুকেন্দ্রিক চিন্তনকে অভিনব মাত্রা দিতে পেরেছে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়টি নির্ণিত হয়েছে সাহিত্যিক বিমল করের সৃষ্টিমানসে মৃত্যুর কেন্দ্রিকতাকে লক্ষ্য করে। তবে তার আগে সংক্ষিপ্তভাবে মৃত্যুকেন্দ্রিক প্রচলিত ভাবনাগুলিকে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

তাহলে প্রশ্ন হল মৃত্যু কী? মৃত্যুর পরে কী ঘটে? অথবা আত্মা ও মৃত্যুর সংযোগ কোথায়? - এসব রহস্যাচ্ছন্ন। এই মৃত্যুরহস্য ভেদের জন্য নানান লৌকিক বিশ্বাস, ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। যেমন- সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে। ইহজগতে ভালো কাজের পুরস্কার স্বরূপ পরকালে আত্মার স্থান হয় স্বর্গে এবং খারাপ বা পাপ কর্মের জন্য আত্মার স্থান হয় নরকে। যদিও ভারতীয় পুরাণ মতে, আত্মা অবিনশ্বর। এর সৃষ্টিও নেই ধ্বংসও নেই। এটিকে রোদে পোড়ালে কিংবা জলে ডোবালেও এটি ধ্বংস হয় না। এটি কেবল এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয় মাত্র। এক্ষেত্রে দুটি দার্শনিক মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। যথা -

১. বস্তুবাদী দর্শন
২. ভাববাদী দর্শন

বস্তুবাদী দর্শন অনুযায়ী মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি। এর মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, মুক্তি নেই কেবল আত্মার ধ্বংস ও নশ্বরতা। চার্বাকপন্থীরা এই বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। এই দর্শনশাস্ত্র ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না; এমনকি কর্মফলবাদ বা জন্মান্তরবাদের প্রতিও কোনো বিশ্বাস রাখে না। তাদের মতে, মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। তাই তাদের কাছে আলাদা করে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই।

বস্তুবাদী দর্শনের বিপরীতে প্রচলিত আছে ভাববাদী দর্শন। বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী। যার মূল কথা হল, আত্মা অবিনশ্বর, কেবলমাত্র দেহের পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে। মানুষের দেহকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- পার্থিব জড়দেহ ও সূক্ষ্ম বায়বীয় দেহ। বেদান্ত ভাষ্য অনুযায়ী:

"এই সূক্ষ্মদেহই আত্মার অন্তর
আবরণ আর পার্থিব জড়দেহটা

হল তার বাইরের আবরণ।"[১]

অর্থাৎ, মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। মৃত্যু হল আত্মার অবস্থান পরিবর্তন।

আবার পাশ্চাত্য দর্শনেও মৃত্যু নিয়ে বহু মতামতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাক্ সক্রেটিস যুগ থেকে সক্রেটিস পরবর্তী যুগ পর্যন্ত মৃত্যুকেন্দ্রিক চিন্তনের পরিবর্তন ঘটেছে। একের পর এক যুদ্ধ, হানাহানি, হত্যালীলা, অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর যে নিদারুণ প্রবাহ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রবাহিত হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে মানুষের মৃত্যুকে দূরের বলে মনে হল না। বরঞ্চ খুব কাছের অবস্থানে মৃত্যুকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু মৃত্যু মাত্রই কেবল দৈহিক মৃত্যু নয়। দৈহিক মৃত্যুর থেকে অনেক বেশি তা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার অপমৃত্যু, ব্যক্তির মানসিক ও চারিত্রিক অপমৃত্যু। যা পরবর্তীতে উত্তর আধুনিকতা সাহিত্যের একটি অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল
পশমের অন্তর্গত হয়ে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল
খুব কাছে বসে আছে হিতব্রতী অসুস্থ বিড়াল।"[২]
- ('বিড়াল'/ শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

আর যার কারণে, ব্যক্তিজীবনে ঘটে যাওয়া মৃত্যুর দৃষ্টান্তগুলি প্রাক্-সক্রেটিস, সক্রেটিস ও সক্রেটিস পরবর্তী মৃত্যুকেন্দ্রিক ভাবনাগুলোকে ছাপিয়ে আধুনিক ও উত্তরাধুনিক যুগে প্রসারিত হয়েছে। যার প্রেক্ষাপটে চলে আসে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বস্ত পরিস্থিতি ও অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি এবং শাসকশ্রেণির একনায়কতন্ত্রের প্রকোপে জীবনের অর্থহীনতা ও মৃত্যুর অমোঘতা, স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব অপ্রাপ্তি ও চরম হতাশা। আর যার থেকে উদ্ভূত হয় পরাবাস্তববাদ, Absurdity ও অভিব্যক্তিবাদের। কাফকার 'The Trial' ও 'Metamorphosis' - এর যে ধোঁয়াটে জগৎ, সেখানে ব্যক্তিমানুষ বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, ভয়-যন্ত্রণার ও বিকারের অসহায় লক্ষ্যবস্তু। তবে 'অ্যাবসার্ড' দর্শন পূর্ণতা পেল সার্ত্রে ও ক্যামুর রচনায়। মানুষকে দেখা হল এক নির্বান্ধব, বৈরী বিশ্বে বিচ্ছিন্ন, বিপন্ন এক জীব হিসেবে। যার সামনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। শূন্য থেকে শুরু আর শূন্যতেই শেষ। এ-এক পীড়িত উদ্ভট অস্তিত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অ্যাবসার্ডবাদীরা এই রকম ভাবতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে একে কেন্দ্র করে সাহিত্যে মৃত্যু চেতনার পথটি প্রশস্ত হয়।

ব্যক্তি ভেদে সংবেদনশীলতার প্রকাশ ভিন্নধর্মী। ব্যক্তি প্রত্যহ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও টানাপোড়েনের জটিল সমীকরণের মধ্যে দিয়ে বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, যা প্রাথমিকভাবে সুপ্তাবস্থায় থাকে। ব্যক্তিমানসে সঞ্চিত সুপ্ত অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে যখন তার অনুভূতির স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে তখনই সেই সুপ্ত অভিজ্ঞতার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে।

আমাদের আলোচ্য সাহিত্যিক বিমল করের সৃষ্টিমানসের চেতন স্তরে সঞ্চিত কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর মৃত্যুকেন্দ্রিক চিন্তনের পথটিকে উন্মুক্ত করেছে। বিংশ শতকের সাত ও আটের দশকের প্রথিতযশা বিভিন্ন সাহিত্যিকদের ভিড়েও যিনি তাঁর হৃদয়বৃত্তির স্বতন্ত্রতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন তিনি হলেন বিমল কর। তাঁর সৃষ্টিভাবনায় আদ্যোপান্ত ছড়িয়ে রয়েছে জীবনদৃষ্টির অনন্যতা। সূক্ষ্ম জীবনবোধ তাঁকে জীবন ও মৃত্যুর মাঝের দূরত্বকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। সহজ-সরল ভাষায়, আড়ম্বর বর্জিত ভঙ্গিমায়, জটিল শব্দচয়নের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি তাঁর রচনায় উপস্থাপন করলেন এক গভীর জীবনবোধ। যেখানে রয়েছে মৃত্যুর পদচারণা, পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব, নৈতিকতার অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিপর্যয়। তবে সেখানে নেই কোনো হতাশার ও নৈঃরাশ্যের অবদমন। যার পরিসমাপ্তিতে নেমে আসে প্রশান্তির যবনিকা।

বিমল করের এই গভীর জীবন উপলব্ধির অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর বোহেমিয়ান খেয়ালখুশির দ্বারা। শৈশবকালের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন বিহারের ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাই তাঁর রচনায় প্রায়শই উঠে এসেছে সেইসব অঞ্চলের রীতিনীতি, বিশ্বাস ও লোকাচার। একের পর এক মৃত্যু তিনি খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঠাকুমার মৃত্যু, বাবার মৃত্যু, ছোটো বোনের মৃত্যুতে তাঁর জীবনপ্রবাহ পদে পদে স্তিমিত হয়েছে। মৃত্যুকে তিনি কাছে থেকে

বুঝতে চেয়েছেন, আর যার প্রতিফলন ঘটেছে ‘অম্বিকাচরণের মৃত্যু’, ‘জননী’, ‘তিন প্রেমিক ও ভুবন’, ‘নিষাদ’, ‘আত্মজা’, ‘সুধাময়’ প্রভৃতি ছোটগল্পে।

তাই তাঁর গল্পে ‘Fragrance of Death’ থাকলেও তা কখনও ভাবালুতা দোষে দুষ্ট নয়। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মৃত্যুতে অবশ্যই শোকবোধ আছে কিন্তু সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠলে তখন শোকের দাহিকা শক্তি থাকে না; মানুষ আনন্দ বা অমৃত লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলে তা শোকাভিভূতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বকে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারলে তবেই অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়। তাঁর কিছু মৃত্যুকেন্দ্রিক ছোটগল্পের আঙ্গিক আলোচনা করা যাক।

‘আত্মজা’ গল্পটি বিমল করের প্রথম দিককার রচনা, গল্পটির প্লট নির্মিত হয়েছে তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে - যূথিকা, পুতুল ও হিমাংশু। যূথিকা ও হিমাংশুর একমাত্র কন্যা পুতুল, যার বয়স পনেরো বছর পনেরো দিন। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় মেয়ে ও বাবার সম্পর্কের মধ্যে যে স্নেহ ও সরলতা রয়েছে তা যূথিকার চোখে ‘আদিখ্যেতা’র নামান্তর মাত্র। সে মা হওয়া সত্ত্বেও কখনই পুতুল ও হিমাংশুর সম্পর্কটাকে তাদের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার বন্ধনটাকে অনুভব করতে পারে না। হিমাংশুর পুতুলকে সাইকেলে চাপিয়ে স্কুলে দিয়ে আসা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, ছুটির দিনগুলিতে বাবা-মেয়ের একত্রে হাসিখুশিতে মেতে থাকা, শীতের দিনে হিমাংশুর ঠান্ডা-গরম জল দিয়ে পুতুলের চুল ঘষে দেওয়া যূথিকার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

> “সবচেয়ে বেশি রাগ হয় যূথিকার ক্যালেন্ডারের
> লাল তারিখের ওপর। এত ছুটি কেন থাকে।
> অফিস আর স্কুলের - যূথিকা বুঝতে পারে না।”[৩]

কিন্তু কেন এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন যূথিকার? সে কেন সহজভাবে দেখতে পারে না বাবা ও মেয়ের সম্পর্ককে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যূথিকার মানসিক বিকৃতি। কিন্তু এই বিকৃতির পিছনে রয়েছে একটি কারণ, ষোলো বছর বয়সে সন্তান প্রসবের সময় যূথিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং অনেক অর্থব্যয়ের দ্বারা যূথিকার শরীরের ‘গোলমেলে অংশ’টি বাদ দেওয়ার পর সে কোনোক্রমে বেঁচে ওঠে। ফলে, সেই পনেরো বছরের যৌবনদীপ্ত যূথিকার ‘মিষ্টি মোলায়েম চেহারা আর নেই; বিবর্ণ, শুষ্ক, অস্থিসার, দীপ্তিহীন ’চেহারা যেন যূথিকার প্রেম, যৌবন, সরসতা, সহজতা, উজ্জ্বলতা সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। জীবন ও যৌবনের সূক্ষ্ম সম্পর্কে নিজেকে তার অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়। এ যেন এক ‘মনের মৃত্যু’, এক ‘যৌবনের মৃত্যু’। যা যূথিকাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। আর নিজের অজান্তেই সে যেন তার এই শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য পুতুলকে দায়ী করে। তাই হিমাংশু যখন সুইমিং-এর পোশাক পরিহিতা পুতুলের ছবি এনে যূথিকাকে দেখায় তখন যূথিকা পুতুলের অজান্তেই ছবিটিকে বাক্সের ভেতর চালান করে দেয়। পনেরো বছর বয়সী পুতুলের দীপ্তিময় যৌবন যেন তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে প্রতি পদে পদে পুতুলের বয়সের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হিমাংশু ও পুতুলের সম্পর্কের মধ্যে একটি গণ্ডি অঙ্কন করে দিতে চায়।

যূথিকা যেন নিজেকেই ক্রমাগত ফুরিয়ে ফেলে। সে হীনমন্যতায় আক্রান্ত। স্বামীর কাছে সে নিজেকে আর পুতুলকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। আর যার ফলেই তার যেমন স্বামীর সঙ্গে তৈরী সম্পর্কের সুতো ছিঁড়ে যায় তেমনি মেয়ের সঙ্গেও সে রুক্ষ আচরণের দ্বারা নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে যূথিকার মানসিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কেরও মৃত্যু ঘটে।

অন্যদিকে যূথিকার বিপ্রতীপ কোণে হিমাংশুর অবস্থানকে দেখা যায়। গল্পের শুরু থেকেই সে একটি পজিটিভ চরিত্র।

> “প্রখর যৌবনের অমিত তাপে তার প্রাণশক্তি
> উথলে উঠছে, উপচে পড়ছে।”[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হিমাংশুর জীবনস্পৃহা ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ যথেষ্ট সংযত। যূথিকার তীব্র ভর্ৎসনা সত্ত্বেও সে পুতুলকে নিয়ে তার স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তোলে। যূথিকার বিগত যৌবনা রূপকে হিমাংশু কখনই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেনি। বরং 'সেই যখন ফিরে এলো, তখন হৃতস্বাস্থ্য, বাঁ-পা টেনে টেনে হাঁটা নির্জীব স্ত্রীই এক মুক্তপক্ষের বিহঙ্গের আনন্দস্বাদ নিয়ে হিমাংশুর জীবনে।"[৫]

অথচ গল্পের শেষে এই মুক্তচিত্ত হিমাংশুর জীবনের গতি রুদ্ধ হচ্ছে মৃত্যুতে - 'আত্মহননে'। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? হিমাংশুর মৃত্যু যেন কোনোমতেই অভিপ্রেত নয়। তা সত্ত্বেও মৃত্যু এসেছে তার পঙ্কিল গন্ধ নিয়ে। মৃত্যু যেন এক্ষেত্রে নিয়তির উপযাচক হয়ে নয় বরং এসেছে দীর্ঘমেয়াদি কতগুলির ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কের রূপকার হয়ে। গল্পের শুরু থেকেই যূথিকার বিরূপ মনোভাব, লাঞ্ছনার প্রতি হিমাংশু বিশেষ মনোযোগী না হলেও যেন প্রতি মুহূর্তে তাকে দগ্ধ করেছে। যূথিকার অনবরত বাক্যবাণে সে ক্রমাগত জর্জরিত হয়ে উঠলেও কখনই সেটিকে সে মনে স্থান দেয়নি। পুতুলকে ঘিরে যা কিছু তার স্বপ্ন সেগুলিকেই সে রূপায়িত করতে চেয়েছে। যূথিকা পুতুল আর হিমাংশুর মধ্যের সম্পর্কে ঈর্ষা করলেও কখনই তার সেই সম্পর্ক বিকৃত মনে হয়নি যতক্ষণ না পর্যন্ত শিপ্রা, যে কিনা একজন মেয়েদের কলেজের অধ্যাপিকা তাকে ফ্রয়েড কথিত 'ইলেকট্রা কমপ্লেক্স'-র আঁচ অনুভব করিয়ে যূথিকাকে বলে,

"জিনিষটা মোটেই ভালো নয় যূথি... এই ধরণের রুচি খুব খারাপ, নোংরা।"[৬]

যূথিকার মনে আরও একটি বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে দিয়ে শিপ্রা অন্তর্হিত হল কিন্তু বীজ থেকে যে মহীরুহ যূথিকার মন ভেদ করে উঠে দাঁড়ালো তাকে সে অগ্রাহ্য করতে পারল না। নিজের মনের কুৎসিত ভাবটিকে ব্যক্ত করে সে তীক্ষ্ণ আঘাত হানল হিমাংশুর অন্তরে। মাঝরাতে পুতুলের ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত পুতুলকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার মধ্যে, আর কাশি হওয়ার আশঙ্কায় গায়ের লেপটা ঠিক করে দেওয়ার মধ্যে সে কোনো অপরাধ দেখতে না পারলেও যূথিকা তার বিকৃত মনে সেটিকে লালসার আস্ফালন বলে উপলব্ধি করে। যার ফলশ্রুতিতে মৃত্যু যেন ক্রমে ক্রমে হিমাংশুকে অবশ করতে থাকে। তাঁর মনের মৃত্যু ঘটে। নিজেকে সে এক শ্বাপদের সঙ্গে তুলনা করে। আর তার পরেই বাথরুমে গিয়ে খুর হাতে সে যেন যূথিকার করা অপমানগুলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিজের দুহাত ও গলার শিরায় টান দেয়। বেরিয়ে আসা রক্তের মধ্যে সে যেন খুঁজতে থাকে পঙ্কিলতাকে 'পাপের বীজ'কে। এখানে হিমাংশুর এই আত্মহত্যাকে লেখক যেন দেখাতে চাইলেন যূথিকার কুৎসিত অপমানের বিরুদ্ধাচারণ হিসেবে যেন হিমাংশুর এক আত্ম অনুধাবন রূপে।

আলোচিত গল্পটির আঙ্গিকের বিপরীতে আরেকটি ভিন্নধর্মী উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল 'জননী'। গল্পটিতে লেখক তাঁর মৃত্যুচেতনার গভীর দার্শনিক উপলব্ধিকে উপস্থাপন করেছেন। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর পরেও আরও কিছু আছে - এই ধারণা ভাববাদী দার্শনিকরা মনের মধ্যে পোষণ করেন। আর এই ধারণার বাস্তবায়ন ঘটেছে এই গল্পটিতে। গল্পটির শুরুর লাইন –

"আমরা ভাইবোন মিলে মা-র পাঁচটি সন্তান।
বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল।"[৭]
"তার ঠিক দেড় পৃষ্ঠা পরের লাইন,
কপালভরা দাগ আর ছানি চোখ নিয়ে মা
বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার
হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে
আছে।"[৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, দেড়-দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক একে একে পাঁচটি শোকের প্রসঙ্গ ক্রমানুসারে উত্থাপন করলেন।

১. আমাদের সংসারে প্রথম শোক এল
বড়দির বিয়ের পর।[৯]
২. বড়দির পর দ্বিতীয় শোক, মেজদার অন্ধ
হওয়া।[১০]
৩. আমাদের তৃতীয় শোক, বাবার মৃত্যু।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেল।[১১]
৪. বাবার মৃত্যুর বছর দুই পরে আমাদের চতুর্থ
শোকও এল। ছোট বড় জেদী ... একদিন ছোট
বুঝতে পারল, তার বয়সে যতখানি
জীবনীশক্তি স্বাভাবিক, তার অনেক বেশী
সে অত্যন্ত হঠকারির মতন ব্যয় করেছে।[১২]
৫. আমাদের সংসারে পঞ্চম শোক এসেছে সদ্য।
মা মারা যাবার পর। এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা
চলে গেল।[১৩]

কিন্তু শোকের দাহিকা শক্তির বিস্তারিত বর্ণনায় পাঠককে ক্লান্ত করলেন না। ছোটো ছোটো প্যারাগ্রাফেই তিনি শোকের দাহিকা শক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। শোক থেকে উত্তরণের পথের সন্ধান করলেন।

প্রতিটি জনজাতির মধ্যেই মৃত্যুর পরের জীবন সংক্রান্ত বেশ কিছু ধারণা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক রাঁচির এক মুন্ডা বা মুঙ্গেরী গ্রামের কোনো এক বাড়ির দেওয়ালে আঁকা ছবির বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই ছবির বিশিষ্টতার মধ্যেই যেন লেখকের মৃত্যু সংক্রান্ত এক গভীর উপলব্ধির মর্মকথা লুকিয়ে আছে। মৃত্যুর পরের শেষ কল্পনা হল স্বর্গ। কিন্তু মৃত্যুর পর আত্মাকে স্বর্গে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়। এই দীর্ঘপথে যাত্রা করার সময় যাতে আত্মার কোনো কষ্ট না হয় সেজন্য তার কষ্ট লাঘবের দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে দেওয়া হয়। এই গল্পে মায়ের মৃত্যুর পর তার পাঁচ ছেলে- মেয়েও তার দীর্ঘ পথের যাত্রা সহায়ক কিছু দ্রব্য দিতে চেয়েছে। তবে সেগুলো কোনো পার্থিব দ্রব্য নয়।

আমরা প্রতিটি মানুষ অনেকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। প্রত্যেকের এই বৈশিষ্ট্যগুলি একে অন্যের থেকে আলাদা। জীবনের জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমাদের চারিত্রিক পরিবর্তন হয়। তখন অনেক ক্ষেত্রে এই চারিত্রিক পরিবর্তন অন্যের কাছে স্পর্শকাতর হয়েও দাঁড়ায়। তখন তাকে বলা যায় ব্যক্তির 'চারিত্রিক অপমৃত্যু'। এই ধরনের চারিত্রিক অপমৃত্যু সাধারণত খুব কাছের সম্পর্কের মানুষের মধ্যেই উপলব্ধি করা যায়। আলোচ্য গল্প 'জননী'-তে বলা যেতে পারে 'মা'য়ের চারিত্রিক অপমৃত্যু তার দৈহিক মৃত্যুর অনেক আগেই ঘটেছিল। তাই তার ছেলে-মেয়েরা তার যাত্রা সহায়ক পথসামগ্রী হিসেবে বেশ কিছু চারিত্রিক গুণাবলী দিতে চেয়েছে, যেগুলির অভাব ছিল তাদের মায়ের মধ্যে।

> 'অনেকটা সময় চুপ করে থেকে বড়দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মৃদু গলায় টেনে টেনে বলল, "আমি মাকে আমার সেই ভালোবাসার মন দিতে পারি।"[১৪]
>
> 'নিশ্বাস ফেলে বড়দি বলল, "মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারিনি। মা যেন সেই সাহস পায়।"[১৫]
>
> 'ছোট আমার দিকে তাকাল, "আমি মাকে আর কিছু দিতে পারি না, মন ছাড়া, আশা ছাড়া, ভরসা ছাড়া।"[১৬]
>
> 'আমি চাপা গলায় বললাম, "মা দীন ছিল, আর মন কৃপণ ছিল। ...আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব। আর কিছু না।"[১৭]
>
> সবশেষে 'মেজদা' বলল, "মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম। ...এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।[১৮]

লেখকের এই অনন্য উপলব্ধি, শোকের আগুনে দগ্ধ না হয়ে শোককে গভীরভাবে অনুভব করতে পারার মধ্যেই ব্যক্তির উত্তরণ, যা আলোচ্য গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

এই একই আঙ্গিকে রচিত আরেকটি গল্প হল 'তিন প্রেমিক ও ভুবন'। এই গল্পটিতেও রয়েছে শোক থেকে উত্তরণের প্রয়াস। শিবানীর তিন প্রেমিক তার প্রজ্বলিত চিতার আগুনে আহুতি দিয়েছে তাদের অনুতাপকে, যা বহুদিন ধরে তাদের মধ্যে জ্বলেছিল। এই তিনজনই কোনো না কোনো এক সময় শিবানীর সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কেউই শিবানীকে স্ত্রী'র মর্যাদা দেয়নি। একমাত্র ভুবন ছাড়া। শিবানীর তিন প্রেমিকের প্রত্যেকেই শিবানীর মানসিক মৃত্যুর কারণ হয়েছে। তার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের প্রেমিক কমলেন্দু তার 'ইনোসেন্স'কে হত্যা করেছে, পূর্ণ যৌবনের প্রেমিক

শিশির তার কুমারিত্বকে হত্যা করেছে আর শেষ প্রেমিক অনাদি তার আশা-ভরসা ও নির্ভরশীলতার ওপর আঘাত হেনেছে। শিবানীর মানসিক অপমৃত্যুর মঞ্চ আগে থেকেই তৈরি ছিল, শুধু দৈহিক মৃত্যুর দ্বারা শিবানীর মৃত্যুর যজ্ঞ পূর্ণরূপে সাঙ্গ হয়েছে। শিবানীর চিতার সম্মুখে আত্মাভিমানকে বিসর্জন দিয়ে তাদের আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ শোকের দাহিকা শক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করেছে।

আবার 'অপেক্ষা' গল্পটিতে লেখকের মৃত্যুচেতনা অন্যখাতে বয়েছে। আমরা প্রতিদিন একেকটি পদক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনের ব্যস্ততা আমাদের সেই অনুভব থেকে দূরে রাখে। আমাদের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা একেকটি কার্যসম্পাদন করে চলি ঠিকই কিন্তু হঠাৎ যখন মৃত্যু এসে তার উপস্থিতির প্রমাণ দিয়ে যায় তখন আমাদের দৈনন্দিন 'আত্মসর্বস্ব' জীবনযাত্রার গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। 'আমিত্ব'কে পেরিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্বজনীনতার সাপেক্ষে দেখতে চেষ্টা করি। 'অপেক্ষা' গল্পটিতে ঠিক তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। অফিসের কলিগ ভুবনের মৃত্যু হয় আকস্মিকভাবেই। তবে অস্বাভাবিক ভাবে নয়। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে 'ব্রঙ্কোনিমোনিয়া' ভুবনের সজ্জিত জীবনের ছেদ ঘটিয়েছে। সদ্য বিবাহিত ভুবন তার স্ত্রী গৌরীকে নিয়ে দার্জিলিঙ থেকে ঘুরে এসে সাধারণ জ্বরে ভুগে হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটে। এ যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভুবন তার অফিসেরই কলিগ গৌরীকে বিয়ে করেছিল ভালোবেসে। তাদের এতদিন ধরে দেখা আসা স্বপ্নের ইতি ঘটে অনাহুত আগন্তুক মৃত্যুর উপস্থিতিতে। 'মানুষের কখন কি হয়, কখন ডাক আসে কে জানে?'[১৯] ভুবনের এই অসময়ে হঠাৎ চলে যাওয়া শিবতোষের মনে আঘাত হানে। হঠাৎ মৃত্যু যদি তার গোপন অবস্থান ত্যাগ করে সামনে এসে দাঁড়ায় তবে কে তার থেকে নিস্তার পায়? ভুবনের মৃত্যুর প্রসঙ্গে শিবতোষের মনে পড়ে তার বাবার মৃত্যুর কথা। তার অন্যমনস্কতা ও' ভুলো' স্বভাবই যেন বাবার মৃত্যুর কারণ - এই উপলব্ধি যেমন একদিকে তাকে দগ্ধ করে তেমনি সুরমার সঙ্গে তার অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্য সম্পর্কের অপমৃত্যু এতদিন পরেও তাকে অনুতপ্ত করে। 'মৃত্যু এবং প্রেম - দুটি জিনিসের কোনোটিকেই সে নিজের আয়ত্তে আনতে পারেনি'[২০] - এই উপলব্ধি তার হৃদয়কে বিক্ষত করেছে। এই গল্পে একটি চিঠির প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু চিঠির প্রেরকের কথা শিবতোষ জানে না। প্রেরকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎও হয়নি। তবুও এই চিঠি-ই যেন তার মনকে করে তুলেছে অসুস্থ, চঞ্চল। চিঠির প্রেরকের সঙ্গে তার যে লুকোচুরি খেলা তা যেন মানুষের সঙ্গে মৃত্যুর লুকোচুরি খেলার সদৃশ। মৃত্যু আসেই কখনো সাক্ষাতে কখনো অসাক্ষাতে। কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করা যায় না। কেবল সে যেন বলতে থাকে 'আমি আসব। আমার অপেক্ষা করো।'[২১] চিঠিটিকে যেমন শিবতোষ অন্যমনস্কভাবে একসময় এড়িয়ে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবে আমরাও অন্যমনস্কভাবে মৃত্যুকে এড়িয়ে থাকি। কিন্তু অগ্রাহ্য করলেই কি তার উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায়? যায় না। যেমনটি শিবতোষ তার চিঠি ও চিঠির প্রেরকের ভাবনাকে মন থেকে সমূলে উৎপাটন করতে পারেনি। মৃত্যু আসবেই। আর আমরাও একদিনে আমাদের অন্তিম গন্তব্যে পৌঁছে যাব। কিন্তু যতদিন না মৃত্যু আমাদের কাছে না আসছে ততদিন আমাদের অনন্ত অপেক্ষাতে থাকতে হবে।

'আঙুরলতা' গল্পেও মৃত্যুর পঙ্কিলতা বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পে নন্দর মৃত্যুর বীভৎসতার সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ের বীভৎসতাও একসূত্রে যেন গ্রথিত হয়েছে। পচনশীল সমাজের প্রতিটি মানুষের দেহে মৃত্যুর পচনের উৎকট গন্ধ এমনকি গঙ্গার জলও বিশুদ্ধ নয়। মৃত্যুর পঙ্কিলতা যেন সামাজিক মূল্যবোধের অস্থিমজ্জায় পচন ধরিয়েছে। নন্দর মৃত্যুর পর তার দাহকার্যের জন্য আঙুরের নিজের দেহের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ মানবিক অবক্ষয়কে সূচিত করেছে। তাই কেবল যৌনপল্লীর আঙুর কিংবা আতা কিংবা হিমুর শরীর অশুদ্ধ নয় সমাজের মানিকবাবুদের মতো লোক, বিশুর মতো লোক, প্রভুলালের মতো লোকের শরীরের পচনের দুর্গন্ধ যেন আরো বেশি অসহনীয়।

'ইঁদুর' গল্পটি লেখকের বাস্তবধর্মী সমাজচিন্তা এবং মানুষের জীবনের দৈনন্দিন সংকটের একটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। মানব জীবনের সংকীর্ণতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং আধুনিক সমাজের অসহায়ত্বকে প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। গল্পের মূল প্রতীক হিসেবে 'ইঁদুর'কে দেখানো হয়েছে, যা কেবল বাস্তবিক অর্থে নয়, রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইঁদুরের উৎপাত যেমন ধ্বংস এবং বিশৃঙ্খলার প্রতীক, তেমনি এটি সমাজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের ইঙ্গিতও দেয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মলিনা ক্রমাগত ইঁদুরের উৎপাত থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে বুঝতে পারে যে

ইঁদুরকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়। এটি আধুনিক জীবনের সেইসব সমস্যার প্রতিফলন, যেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন এবং এগুলো মানুষের জীবনের একটি অংশ হয়ে ওঠে। অথচ এই অবক্ষয় মানুষের মনের মধ্যে বিরাজ করে এবং দিনরাত তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়।

"You begin, by killing a cat and
you end by killing a man."[২২]

'নিষাদ' গল্পটিতে রয়েছে অভিমানী জলকুর মৃত্যু। একরকম ভবিষ্যদ্বাণী থেকেই গল্পটির সূচনা।

"ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে
একদিন। হয়ত আজ... কিংবা কাল।"[২৩]

কিন্তু কেন এই ভবিষ্যদ্বাণী? গল্পটির পাঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে দেখা যায় জলকুর সমস্ত আক্রোশ রেলগাড়ি ও রেললাইনের ওপর। তার প্রিয় ছাগল মানিকের মৃত্যুর জন্য সে মনে মনে রেলগাড়ি ও রেললাইনকে দায়ী করে। আর সেই ক্ষোভ থেকেই সে রেললাইনের ওপর পাথর ছোঁড়ে। কারণ, সে মানিকের মৃতদেহ রেললাইনের ধারে পেয়েছিল। কিন্তু গল্পের কথকই তার ছাগলের ঘাতক কিন্তু সেই কথা সে জলকুর কাছে প্রকাশ করেনি। নিঃশব্দসারে সেই নিষাদ, সেই শিকারী। জলকুকেও সেই মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছে। জলকুর মৃত্যু ঘটেছে রেললাইনে কাটা পড়ে। এই গল্পে লেখক মৃত্যুর অনিবার্যতাকে প্রকৃত রূপ দিয়েছেন।

মৃত্যু ভাবনার পথ ধরেই বিমল করের গল্পে দেখা যায় পরাবাস্তব জগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্ক। তাঁর গল্পে মৃত্যুর উপস্থিতি আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে সম অবস্থায় অবস্থানের কারণেই। শুধু মৃত্যুর অনুষঙ্গই নয় প্রকৃতির অনুষঙ্গতাও ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। 'জননী' ও 'তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা যেমন একদিকে রোমান্টিসিজমের জন্ম দিয়েছে তেমনিই উত্তর আধুনিক যুগের মানসিক অবক্ষয়কেও প্রাধান্য দিয়েছে। আবার 'আত্মজা' গল্পে হিমাংশুর আত্মহত্যা এবং 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে হেমাঙ্গের আত্মহত্যার মধ্যে অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেও হিমাংশু আর হেমাঙ্গ কিন্তু একেবারেই জীবনের সংঘাতে হেরে যাওয়া যোদ্ধা নয়। শিবতোষের মৃত্যুর জন্য 'অপেক্ষা' তাকে একেবারে নিঃশেষ করে দেয়নি। বরং সে মৃত্যুর অনিবার্যতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। যৌনপল্লীর আঙুর মৃত্যুতেই সমস্ত পাপের স্খলনকে খুঁজে পেয়েছে।

তাঁর গল্পে মৃত্যু এসেছে নানা ভূমিকায়। কিন্তু কোনো মৃত্যুতেই শোকের ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শোককে গ্রহণ করে অথচ শোকে নিমজ্জিত না হয়ে শোককে উৎযাপন করার মধ্যে জীবনের সার্থকতার বাণী তাঁর রচনায় বারে বারে ফিরে এসেছে। গভীর জীবনবোধের সন্ধানে তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য, যা তাঁর রচনাকে অভিনবত্ব দিতে সক্ষম হয়েছে। বলা যেতে পারে, জীবনবোধের সামঞ্জস্যে মৃত্যুর অবস্থানে তাঁর গল্পগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সেই বিষয়েই আলোকপাত করা হল।

Reference:

১. বিবেকানন্দ, স্বামী, 'আত্মা কি অমর', 'মরণের পরে', উদ্বোধন কার্যালয়, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৬
২. 'শক্তি, চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', অষ্টবিংশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০২১, পৃ. ২১৭
৩. 'বিমল করের বাছাই গল্প', ১ম সংস্করণ, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, আশ্বিন, ১৩৭১, পৃ. ১০৬
৪. তদেব, পৃ. ১০৫
৫. তদেব
৬. তদেব, পৃ. ১১৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 104 - 112
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. তদেব, পৃ. ২৭৬
৮. তদেব
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব, পৃ. ২৭৭
১২. তদেব
১৩. তদেব
১৪. তদেব, পৃ. ২৮২
১৫. তদেব, পৃ. ২৮৩
১৬. তদেব, পৃ. ২৮৫
১৭. তদেব, পৃ. ২৮৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৮৭
১৯. তদেব, পৃ. ২৯০
২০. তদেব, পৃ. ২৯৬
২১. তদেব, পৃ. ৩০৮
২২. তদেব, পৃ. ২৩৮
২৩. তদেব